10 JAN

শিশুশিক্ষা বনাম পরীক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষা | বিনয় মিত্র

শিক্ষা-গবেষক

অনেকেই মনে করেন, 'শিশুকে যত চাপের মধ্যে রাখা যাবে, তার চঞ্চলতা ও দুষ্টুমি তত হ্রাস পাবে; তাতে সে ক্রমেই ভালো শিশু হয়ে উঠবে।' তাই শরীরের ওজনের চেয়েও বেশি ওজনের বই-খাতা-কলম-স্কেল চাপিয়ে দিয়েছি ঘাড়ে। খেলতে গিয়ে যেন দুষ্টুমি করতে না পারে, সে জন্য 'বিশাল কলেবরবিশিষ্ট বাড়ির কাজ' চাপিয়ে দিয়েছি তার মাথায়, ঘুমের সময় ব্যতীত বাকি এক মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয়, সে জন্য স্কুল সময়ের বাইরের সময়টায় তাকে যুক্ত করে রেখেছি প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টারের সঙ্গে। ক্লাস টেস্ট-মডেল টেস্ট, এই টেস্ট-সেই টেস্ট– হরেক রকম টেস্টের চাপে রেখে তাকে 'নির্ভেজাল বিদ্বান' বানাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিশুকে চাপে রেখে তাকে শান্ত-সুবোধ-বিদ্বান বানাবার জন্য তার পরিবারের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, এর সঙ্গে এক সময় যুক্ত হয়েছে জনকল্যাণকামী সদাশয় সরকারও এবং এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ পরীক্ষাকে 'জাতীয়করণ' করে নিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। এই দূরদর্শী মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে চালু করা হয়েছে 'পিইসি-ইবতেদায়ি-জেএসসি-জেডেসি' প্রভৃতি সুভাষিত নামের নানাবিধ পরীক্ষা।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য সনদ অর্জন, জীবনের লক্ষ্য চাকরি পাওয়া এবং টাকা কামানো– এই শিক্ষার সঙ্গে জীবন ও জ্ঞানচর্চার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। কথা হলো, যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মনন ও চিন্তাচর্চা গুরুত্ব পায় না, যে শিক্ষা কেবল সনদ ও চাকরিমুখী, সেই দেশে গুরুত্ববর্জিত, অসার সনদ জোগানোর জন্য রাজকোষাগারের কোটি কোটি টাকা ব্যয়পূর্বক দেশের সব জনজীবনকে তুমুলভাবে প্রভাবিত করে, লাখ লাখ শিশুকে 'পিইসি-ইবতেদায়ি-জেএসসি-জেডেসি পরীক্ষা' নামক 'মহারণে' অবতীর্ণ করাতে হবে কেন? এই মূল্যহীন 'সনদযুদ্ধ' কেন আমাদের শিশুদের দিনের পর দিন উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবে, শিশু যেন ফলহীন পরীক্ষায় 'ভালো ফল' অর্জন করতে পারে, সে চিন্তায় তার অভিভাবককে কেন 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'– জাতীয় অস্থির জীবন কাটাতে হবে? যে সনদ মূল্যহীন, জীবনে কোনো কাজেই লাগবে না, সেই সনদের জন্য সরকার শিশু ও তার অভিভাবকের শ্রম ও অর্থ ব্যয়– এর কি আদৌ প্রয়োজন আছে?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন; ভালো জিনিস যত কম হয়, ততই ভালো। কিন্তু আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সবাইকে 'ভালো' দেখানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, এখানে জ্ঞান অর্জন খুবই গৌণ বিষয় হয়ে গেছে, ভালো 'গ্রেড' পাওয়াকেই ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র পরম আরাধ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

লক্ষণীয় বিষয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তর– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সনদপ্রাপ্তির জন্য ছাত্রছাত্রীকে মোট ১৩টি (চতুর্থ বিষয় না থাকলে ১১টি) পরীক্ষা দিতে হয়। পক্ষান্তরে যে সনদের কোনো মূল্যই নেই, সেই জেএসসি সনদ পাওয়ার জন্য কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ১৩টি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা', 'শারীরিক শিক্ষা' প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষা না হয় মানা যায়; কিন্তু তাকে (এমনকি পিইসি পরীক্ষার্থীকেও) বাধ্যতামূলকভাবে 'চারু ও কারুকলা' নামক পরীক্ষাটি দিতে হবে কেন? শিশুকে একই সঙ্গে সব বিষয়ে 'বিদ্বান' বানাবার এই শিক্ষা পদ্ধতি কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষাবিদরা শিশুশিক্ষার জন্য যেসব পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেখানে চাপ প্রয়োগ করে বিদ্যাদানের কথা নেই শিশুশিক্ষায়– অনেক দেশে পরীক্ষা পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু আমরা বিদ্যার ভারি বোঝা শিশুর কোমল কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে, উপদেশের নানাবিধ রঙে সাজিয়ে তাকে 'পরীক্ষা হলে' পাঠাই, তার বয়সানুগ শক্তি-সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করে কেবলই উচ্চ গ্রেডের আশায় বুক বাঁধি, যেন ওই গ্রেডপ্রাপ্তিটাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– শিক্ষার্থীকে শ্রেণিমুখী করা এবং তাকে মূল পাঠ্যবইয়ের দিকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু 'যে দেশে যত বেশি দুর্নীতি, সে দেশে তত বেশি আইন'– ওইসব পুস্তকি আইন যে দুর্নীতি রোধ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ–এর প্রমাণ পাই আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রের কাঠামোবদ্ধ রূপ আছে, কিন্তু কোন প্রশ্নটি, কোন রূপে ও অবয়বে পরীক্ষার জন্য 'ইমপোরটেন্ট' বা 'ভেরি ইমপোরটেন্ট' হিসেবে গণ্য হবে, তা বিদ্যা বিক্রেতাদের আঁচ করার সামর্থ্য নেই। এ ক্ষেত্রে যেমন একটি বিষয় ইংরেজির কথাই বিবেচনা করা যাক– একই বিষয়ের একাধিক স্কুলশিক্ষক– একাধিক কোম্পানি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ নিজ পছন্দের গাইড-নোট বইটি কেনাতে বাধ্য করেন শিক্ষার্থীকে। ওদিকে প্রাইভেট টিউটর, তিনিও অন্য একটি কোম্পানির বিজ্ঞাপনী এজেন্ট হিসেবে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করেন। কোচিং-সেন্টার দেখে ভিন্ন কোনো কোম্পানির স্বার্থ। ফলে এক ইংরেজি বিষয় সেটিকে ধাতস্থ করার জন্য (মূলত কমন পড়ার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য) একেকজন শিক্ষার্থীকে অনেকগুলো নোট-গাইড বই কিনতে হয়। এ ব্যাপারটা কেবল যে 'ইংরেজি'র বেলায়ই প্রযোজ্য, তা কিন্তু নয়। যেহেতু আমাদের শিক্ষকরা সৃজনশীল ধারার পঠনপাঠন, প্রশ্ন প্রণয়নের ব্যাপারে যথাযথ অভিজ্ঞ নন, তাই তারা নিজেরাও নোট-গাইড বইকে ঘিরে আবর্তিত হন এবং একেকজন শিক্ষক একেক কোম্পানির নোট-গাইড অনুসরণ করে এর সংক্রমণ ছড়িয়ে দেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। বেচারা শিক্ষার্থী, সে যেহেতু দুর্ভাগা পরীক্ষার্থীও; তাই তাকে অর্থহীন সনদ অর্জনের জন্য কেবল বড় সংখ্যার অনেকগুলো পরীক্ষা দিলেই চলে না, এক একটা বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে বেশ ক'টি কোম্পানির বই পড়ে, তবেই পরীক্ষা হলে যেতে হয়। এত সব বই পড়ে, কোচিং-প্রাইভেট করে তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটল কি ঘটল না, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় 'সব সম্ভবের দেশে', আমাদের আগ্রহ শুধু তার সনদের ভারিত্ব ও পুরুত্বের দিকে, তার গ্রেডের দিকে। এই গ্রেড ও সনদসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীকে 'বিদ্যার্থী' নয়–'নম্বরার্থী' বা 'গ্রেডার্থী' হিসেবে তৈরি করছে, এর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন নয়, কেবলই দেখি দুঃস্বপ্ন।